সেক্যুলারিজম মানে কি সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা?

অভিজিৎ রায়

আমার আগ্রহের কারনেই হোক, আর 'মুক্তমনা'র সাথে আমার দীর্ঘদিনের সংশ্লিষ্টতার কারণেই হোক বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে আমাকে লিখতে, আলোচনা করতে এবং বিতর্কে অংশ নিতে হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টিও মাঝে মধ্যে চলে আসে। বিতর্ক করতে গিয়ে অনেকের কাছ থেকেই যা শুনি তা হল, স্যেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দের মানে হচ্ছে সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা। এমনকি যারা ধর্ম মানেন না, এবং উদারপন্থী বলে কথিত তাদের অনেকেই ধর্মনিরপেক্ষতাকে এভাবে দেখেন।

বিষয়টি আলোচনার দাবী রাখে। স্যেকুলার শব্দের মানে কি সত্যই সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা? অন্ততঃ রাষ্ট্রীয় ভাবে বাংলাদেশ কিংবা ভারতের মত দেশগুলোতে এখন তাই প্রচার করা হয়। বিভ্রান্তি সে কারণেই। আসলে কিন্তু 'সেক্যুলারিজম' শব্দটির অর্থ -'সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা' নয়, বরং এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে একটি মতবাদ, যা মনে করে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি থেকে ধর্মকে পৃথক রাখা উচিৎ। আমেরিকান হেরিটেজ ডিকশনারীতে secularism শব্দটির সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে এভাবে -

> The view that religious considerations should be excluded from civil affairs or public education

এ সংজ্ঞা থেকে বোঝা যাচ্ছে, ধর্মকে রাষ্ট্রের কাজের সাথে জড়ানো যাবে না- এটাই সেক্যুলারিজমের মোদ্দা কথা। ধর্ম অবশ্যই থাকতে পারে, তবে তা থাকবে জনগণের ব্যক্তিগত পরিমন্ডলে - 'প্রাইভেট' ব্যাপার হিসেবে; 'পাবলিক' ব্যাপার স্যাপারে তাকে জড়ানো যাবে না।

ভারত তার জন্মলগ্ন থেকেই 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করে এসেছে (যদিও ভারতের সংবিধানে 'অফিশিয়ালি' ধর্মনিরপেক্ষতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অনেক পরে)। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু সেক্যুলারিজমের প্রকৃত সংজ্ঞা অনুধাবণ করতে পেরেছিলেন অনেক ভালভাবে। তিনি রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী থেকে ধর্মকে পৃথক রাখাই সঙ্গত মনে করতেন, জাতীয় জীবনে সব ধর্মের প্রতি উদাসীন থাকাটাই তার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হত। তিনি বলতেন -

> 'ধর্ম বলতে যে ব্যাপার স্যাপারগুলোকে ভারতে কিংবা অন্যত্র বোঝানো হয়, তার ভয়াবহতা দেখে আমি শঙ্কিত এবং আমি সবসময়ই তা সোচ্চারে ঘোষণা করেছি। শুধু তাই নয়, আমার সবসময়ই মনে হয়েছে এ জঞ্জাল সাফ করে ফেলাই ভাল। প্রায় সব ক্ষেত্রেই ধর্ম দাঁড়ায় ধর্মান্ধতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা, মূঢ়তা, কুসংস্কার আর বিশেষ মহলের ইচ্ছার প্রতিভূ হিসেবে'।

নেহেরুর কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে, ধর্মের অন্তর্নিহিত কাঠামোগত প্রতিক্রিয়াশীলতার কারনেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে, পার্থিব বিষয় আষয়ের সাথে সাথে জড়ানো যাবে না। নেহেরুর অনুপ্রেরণা আমেরিকার 'ফাউন্ডিং ফাদার'রা ছিল কিনা জানি না - যারা আমেরিকার সংবিধান তৈরির সময় প্রতিষ্ঠার সময় ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা রেখেছিলেন, খুব বলিষ্ঠ ভাবে* -

> "As **the Government of the United States of America is not, in any sense, founded on the Christian religion**; as it has in itself no character of enmity against the laws, religion, or tranquility, of Musselmen; and as the said States never have entered into any war or act of hostility against any Mehomitan nation, it is declared by the parties that no pretext arising from religious opinions shall ever produce an interruption of the harmony existing between the two countries." (ref. The Treaty of Tripoli, drafted in 1976 under George Washington, and signed by John Adams in 1976)

আসলে অভিধানে secular শব্দটির অর্থও করা হয়েছে এভাবে - 'Worldly rather than spiritual' । সেক্যুলারিজমের অন্যান্য প্রতিশব্দগুলো হল - worldly, temporal কিংবা profane। শবার্থগুলো খুব ভালভাবে খেয়াল করলে বোঝা যাবে, এর অবস্থান ধর্ম কিংবা আধ্যাতিকতার দিকে নয়, বরং এর একশ আশি ডিগ্রী বিপরীতে। সেজন্য, সেক্যুলারিজমের বাংলা প্রতিশব্দ অনেকে খুব সঠিকভাবেই করেন - 'ইহজাগতিকতা'।

অথচ সেই 'ইহজাগিতিক' ভারতেই রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন পঞ্চাশের দশকে ঘোষণা করলেন, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয় বরং সর্ব ধর্মের সহাবস্থান, এবং তিনি Hindu view of life এর কল্পিত ভাববাদী পূর্ণতায় তিনি আস্থাবান। 'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়' - এই শ্লোগানটি বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী দল আওয়ামিলীগও খুব জোরে সোরে বলার চেষ্টা করে। তবে এ শ্লোগানটির মধ্যেই রয়েছে এক ধরণের 'শুভঙ্করের ফাঁকি'। এ ফাঁকিটি চমৎকার ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তার 'ইহজাগিতিকতার প্রশ্ন' প্রবন্ধে। এ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে আমার আর সাদ কামালীর যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত 'স্বতন্ত্র ভাবনা' (চারদিক, ২০০৮) বইয়ে-

> 'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়, এই কথাটা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর পরই খুব জোরেসোরে বলা হচ্ছে। কথাটা সত্য বটে আবার মিথ্যাও বটে। সত্য এ দিক থেকে যে, রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা নাগরিকদের এ পরামর্শ দেয় না যে, তোমাদের ধর্মহীন হতে হবে; কিন্তু তা বলে এমন কথাও বলে না যে, রাষ্ট্র নিজেই সকল ধর্মের চর্চা করবে, কিংবা নাগরিকদের নিজ নিজ ধর্ম চর্চায় উৎসাহিত করবে। রাষ্ট্র বরঞ্চ বলবে ধর্মচর্চার ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিজের কোন আগ্রহ নেই, রাষ্ট্র নিজে একটি ধর্মহীন প্রতিষ্ঠান।, ধর্ম

* আমেরিকার ফাউন্ডিং ফাদারদের প্রধান ছিলেন যারা তাদের অনেকেই আসলে ধর্মহীন নাস্তিক ছিলেন বলে অনেকে দাবী করেন। ক্রিস্টোফার হিচেন্স তার 'Thomas Jefferson: Author of America' বইয়ে দাবী করেছেন যে, জেফারসন সম্ভবত নাস্তিকই ছিলেন, এমন কি তার সময়েও, এবং প্রবলভাবেই। রিচার্ড ডকিন্সও তার বইয়ে এমন ইঙ্গিত করেছেন। তবে নাস্তিক হোন বা না হোন আমারিকার ফাউন্ডিং ফাদারেরা যে সেক্যুলার ছিলেন, এটা তাদের বিভিন্ন লেখালিখি থেকে স্পষ্ট। পরবর্তীতে ফাউন্ডিং ফাদারদের আদর্শ থেকে আমেরিকার বিচ্যুতি প্রবলভাবে লক্ষ্যনীয়। আমেরিকার ডলারে লিখিত 'ইন গড উই ট্রাস্ট' এমন একটি ভন্ডামীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

> বিশ্বাস নাগরিকদের সম্পূর্ণ ব্যাক্তিগত ব্যাপার। রাষ্ট্রের ওই ধর্মহীনতাকেই কিছুটা নম্রভাবে বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষতা।'

খুবই দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, আওয়ামিলীগ ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আউরে মুখে ফ্যানা তুলে ফেললেও তারা ধর্মনিরপেক্ষতার মূল সুরটি কখনোই অনুধাবন করতে পারে নি। তার প্রমাণ পাওয়া যায় আওয়ামিলীগের ওয়েব সাইট (http://www.albd.org/) দেখলেই। আওয়ামিলীগের ওয়েব সাইটে মাথার উপরে 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান' লেখা বানীটি তারই পরিচয় বহন করে। অথচ এক সময় আওয়ামিলীগই 'আওয়ামী মুসলিম লিগ' থেকে মুসলিম শব্দটি উঠিয়ে দেবার সাহস দেখাতে পেরেছিল কিংবা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রিয় মূলনীতি হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। সে সময় রাষ্ট্রিয় মূলনীতিগুলো ছিল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। মুক্তিযুদ্ধের পরিপেক্ষিতে খুব স্বাভাবিক ছিল সে অংগীকার। কিন্তু এর জন্য যে বিশাল সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি প্রয়োজন তা তাদের নেতাদের ছিল না, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তো ছিলই না।

ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করলেও এর মুল ভাবটি তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে স্পষ্ট ছিল- এমন কোন নজির পাওয়া যায় নি। পাকিস্তানী কারাগার থেকে ঢাকায় ফিরে এসে রেসকোর্স ময়দানে বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান যে বক্তৃতা দেন তাতে তিনি বাংলাদেশকে 'দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র' হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন তা কম তাৎপর্যপূণ নয়। ওই বছরেরই সাতই জুন তারিখের বক্তৃতায় শেখ মুজিব ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে যা বলেছেন তা হল -

> 'বাংলাদেশ হবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান মুসলমানের ধর্ম পালন করবে, হিন্দু হিন্দুর ধর্ম পালন করবে। খ্রীস্টান তার ধর্ম পালন করবে। বৌদ্ধও তার নিজের ধর্ম পালন করবে। এ মাটিতে ধর্মহীনতা নেই, ধর্মনিরপেক্ষতা আছে।'

এ বক্তৃতা থেকে মুজিবের 'সর্বধর্মের প্রতি সদ্ভাবের' সুর ধ্বনিত হলেও সেক্যুলারিজমের মুল সুরটি অনুধাবিত হয় নি। আর হয় নি বলেই, সে সময়কার সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদে 'ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার সুযোগ লোপ' করা হলেও, প্রবণতা দেখা দিল রাষ্ট্র কর্তৃক সকল ধর্মকে 'সমান মর্যাদাদানের'। তাই বেতারে, টেলিভিশনে, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে - সর্বত্র কুরান শরীফ, গীতা, বাইবেল আর ত্রিপিটক পাঠ করা হতে লাগলো এক সংগে। এ আসলে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা নয়, বরং ধর্ম আর শ্রদ্ধার মিশেল দেওয়া এক ধরণের জগাখিচুরি। সহজ ভাষায় বলা যেতে পারে 'ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতা'। যত দিন গেছে, ততই মুজিব এমনকি এই ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতা থেকেও দূরে সরে গেছেন। তার শাসনামলের প্রান্তে প্রতিটি ভাষণেই মুজিব 'আল্লাহ', 'বিসমিল্লাহ', 'ইনশাল্লাহ', 'তওবা' প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করতেন। এমনকি শেষদিকে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক প্রতীক 'জয় বাংলা'ও বাদ দিয়ে 'খোদা হাফেজ' প্রবর্তন করেন। শুধু তাই নয়, যে 'ইসলামিক একাডেমী' মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার আলবদরদের সাথে ঘনিষ্ঠতার কারণে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল, তারও পুনরুত্থান ঘটান মুজিব, এবং প্রতিষ্ঠানটিকে 'ফাউন্ডেশন'-এ উত্থিত করেন।

তাও কাগজে কলমে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সংবিধানে যাও বা চালু ছিল মুজিবের সময়, জিয়াউর রহমান এসে তা মূল শুদ্ধ উপড়ে ফেললেন। ধর্ম নিরপেক্ষতার উপরে কাঁচি চালিয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হল 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' আর সমান বেগে মুলনীতি হিসেবে স্থাপিত হল - 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর আস্থা আর বিশ্বাস'কে। সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদ-এর উচ্ছেদ হয়ে গেল। ১২ নং অনুচ্ছেদের উচ্ছেদের ফলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করার সুযোগ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল। এরশাদ সাহেব এসে তো ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্মই বানিয়ে দিলেন। এর পর থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা তো অচ্ছুৎ হয়েছেই, বরং পাল্লা দিয়ে শুরু হয়েছে ধর্মকে তোষণ করে চলার নীতি। বিগত জোট সরকারের আমলে ধর্মকে আর মৌলবাদকে তোষণ করার ফলশ্রুতি স্বরূপ কিভাবে বাংলা ভাইয়ের উত্থান হয়েছিল, কিভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর পরিকল্পিত ভাবে নির্যাতন চালানো হয়েছিল, কিভাবে প্রতিটি জেলায়, সিনেমা হলে, মাজারে, উদীচির অনুষ্ঠানে বোমাবাজির মহড়া চালানো হয়েছিল তা আমরা সবাই দেখেছি।

জনগনকে ইহজাগতিকতায় উদ্বুদ্ধ করার কাজ অতীতের শাসকেরা করে নি, এখনকার শাসকেরাও করছেন না। 'মোহাম্মদ বিড়াল' নিয়ে আলপিন নাটক আর তার পরিসমাপ্তি বায়তুল মোকারমের খতিবের কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনার মহড়া আমরা দেখেছি এ সরকারের আমলেই। এতদিন রাষ্ট্রীয় বিবাদ-বিপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সংসদভবন, বঙ্গভবন এগুলো ছিল উপযুক্ত এবং নির্বাচিত স্থান। আমাদের অতি বুদ্ধিমান রাষ্ট্রের কর্ণধরেরা সেটিকে সংসদভবনের বদলে বায়তুল মোকারমের বৈঠকখানায় নিয়ে উঠালেন। পরে দেখলাম, 'জাতীয় নারী উন্নয়ননীতি' বাস্তবায়নের পরিবর্তে অর্ধ শিক্ষিত, শিক্ষিত মোল্লাগোষ্ঠিকে তোষণ করে চলেছেন এখনকার শাসকেরা। এই ধরনের কাজের সুদূর-প্রসারী প্রভাব কি তারা ভেবে দেখেছেন? এ ব্যাপার-স্যাপারগুলো হয় শারিয়া-কেন্দ্রিক রাষ্ট্রে। বাংলাদেশ আসলে কোন পথে চলেছে এর গতি-প্রকৃতি দেকলেই কিন্তু বোঝা যায়।

ভারতের অবস্থাও যে খুব ভাল তা বলা যাবে না। সেখানেও সেক্যুলারিজমের মূল সুরটি আত্মস্থ করার পরিবর্তে চলছে ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতা জাহির করার মহড়া। এ প্রসঙ্গে প্রবীর ঘোষ তার 'সংস্কৃতি, সংঘর্ষ ও নির্মাণ' বইয়ে লিখেছেন -

> 'বিপুল প্রচারে সাধারণ মানুষ পরিচিত হয়েছে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দের সাথে। জেনেছে, ধর্মনিরপেক্ষতা কথার অর্থ হল - 'সব ধর্মের সমান অধিকার'। বিপুল সরকারী অর্থব্যায়ে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দের এই যে ব্যাখ্যা হাজির করা হচ্ছে এবং এরই সাথে সম্পর্কিতভাবে আমাদের দেশের মন্ত্রী, আমলা ও রাজনৈতিকেরা মন্দিরে মন্দিরে পুজো দিয়ে বেড়াচ্ছেন, গুরুদোয়ারায় নতজানু হচ্ছেন, মসজিদে গীর্জায় শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছেন। দেওয়ালী, ঈদ, বড়দিন ইত্যাদিতে রাষ্ট্রনায়কেরা বেতার, দুরদর্শন মারফৎ শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য দিলে আয়কর থেকে রেহাইয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন।

> সাধারণের ভাল লাগছে - 'সব ধর্মের সমান অধিকার' মেনে নিয়ে মন্ত্রী, আমলা, রাজনীতিকদের সমস্ত ধর্মের কাছে নতজানু হতে দেখে। উদার হৃদয়ের মানুষ হিসেবে নিজেদের ভাবতে ভাল লাগছে জনগনের - হুঁ হুঁ বাবা, আমাদের দেশ ধর্মনিরপেক্ষ। এখানে সব ধর্মই সমান অধিকার ও শ্রদ্ধা পায় মন্ত্রী আমলাদের। মন্ত্রীরা এরই মাঝে জানিয়ে দেন সমস্ত ধর্মের সমান অধিকার বজায় রাখতে, দেশের 'ধর্মনিরপেক্ষতার মশাল' জ্বালিয়ে রাখতে হবে।
>
> 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটিকে নিয়ে কী নিদারুনভাবে অপব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষের মগজ ধোলাই করা হচ্ছে ভাবা যায় না। 'নিরপেক্ষ' শব্দের অর্থ কোন পক্ষে নয়। 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দের অর্থ তাই 'কোন ধর্মের পক্ষে নয়' - অর্থাৎ, সমস্ত ধর্মের সংগে সম্পর্ক বর্জিত। secularism শব্দের আভিধানিক অর্থ - একটি মতবাদ - যা মনে করে রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষানীতি প্রভৃতি ধর্মীয় শাসন থেকে মুক্ত থাকা উচিৎ।
>
> কিন্তু এ কি! এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে আমরা কি দেখাচ্ছি? সেক্যুলার রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানেও এদেশে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। কোন প্রকল্পের উদ্বোধন বা শিলান্যাস করা হয় মন্ত্রোচ্চারণের প্রদীপ জ্বালিয়ে, পুষ্পার্ঘ নিবেদন করা হয় নারকোল ফাটিয়ে। রাজনীতির ব্যবসায়ীরা 'সেক্যুলারিজম'-এর নামে নানা ধর্মকে তোল্লাই দিয়ে সর্বধর্মের সমন্বয় ও সংহতির বাঁধা গৎই এতোদিন বাজিয়ে এসেছেন।'

কিন্তু এই ছদ্ম-নিরপেক্ষতা যে ভারতের কোন উপকারে আসেনি ইতিহাস তার প্রমাণ। জাতিভেদ প্রথা, ধর্মীয় সংঘাত আর দাঙ্গা সে স্বরূপটিই আমাদের সামনে তুলে ধরে। কিছুদিন আগে 'রাম জন্মভুমি'কে পুঁজি করে বাবড়ি মসজিদ ধ্বংস, অযোধ্যায় নির্বিচারে মুসলিমদের হত্যা, গুজরাটে দাঙ্গা আর তার ফলশ্রুতিতে ধর্মান্ধ বিজেপির উত্থান আমাদের কাছে ঐ ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ উৎকট ভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে। গুজরাট দাঙ্গার পর অধ্যাপক জয়ন্তী প্যাটেল তার India: Gujarat riots - communalization of state and civic society" প্রবন্ধে যে মন্তব্য করেছেন, তা খুবই তাৎপর্যপুর্ণ -

> *"Our interpretation of secular as SARVADHARMA-SAMABHAV, protecting every religion and their diverse mode of belief structure, their separate social and civil code, varied customs, mores and faiths, and even education system is not conducive in building an integrated national society or human identity. Our identity is basically communal and has proved to be an obstruction in building a nation- state. It is clear that in interpreting the meaning of the word secular we have disregarded the spirit of the enlightenment and renaissance which was instrumental in building a modern state and the civic society in the west. It seems that we have to interpret the correct meaning of the word secular in our law enforcement.* ***The connotation of the word secular should mean negation of all religions*** *(SARVADHARMA-ABHAV)."'*

রেনেঁসার মানব মুক্তি প্রয়াস কিন্তু তখনকার সময়ের গীর্জাকেন্দ্রিক ধর্মের গোড়ামিকে উপেক্ষা করেই পরিচালিত হয়েছিল। সেক্যুলারিজম বলতে সেখানে সব ধর্মের সহাবস্থান বোঝানো হয় নি। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ ফ্রান্সকে ধর্মনিরপেক্ষ থাকার প্রেরণা যুগিয়েছে। আদি বসতি স্থাপনকারীদের ধর্মীয়ভাবে নিপিড়িত হবার

অভিজ্ঞতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে কোন বিশেষ ধর্মের পক্ষ নিতে দেয় নি। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের জীবনে মুক্তিযুদ্ধের মত এত বড় সড় ঘটনা ঘটলেও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত তাৎপর্য আমরা পয়ত্রিশ বছরেও অনুধাবন করতে পারলাম না। আমার প্রবন্ধটি শেষ করতে চাই স্বতন্ত্র ভাবনা বইটি থেকে অধ্যাপক সনৎ কুমার সাহার একটি উদ্ধৃতি দিয়ে -

> "সেক্যুলারিজম বহু শতাব্দী ধরে (আমাদের উপমহাদেশে) যে ভাবে আচরিত এবং রূপান্তরিত হয়ে আসছে, 'ধর্মনিরপেক্ষতাকে'ই যদি তার ঠিক বঙ্গানুবাদ বলে ধরে নেই, তবে শুধুমাত্র সব ধর্মের সহাবস্থানেই তার অর্থ পুরোপুরি ধরা পড়ে না। এ কথা সত্য যে, ধর্মনিরপেক্ষতায় তার প্রয়োজন আছে, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়; ধর্ম থেকে চিন্তার মুক্তিতেই ধর্মনিরপেক্ষতা পূর্ণতা পায়।"

ধর্ম থেকে চিন্তার মুক্তি ব্যক্তিগত পর্যায়ে না হলেও, রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে অন্তত জরুরী ।

ড. অভিজিৎ রায়, আমেরিকায় বসবাসরত গবেষক এবং বিজ্ঞান লেখক। তিনি মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক; 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' ও 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' গ্রন্থের লেখক। সাম্প্রতিক সম্পাদিত গ্রন্থ - 'স্বতন্ত্র ভাবনা'। ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com